গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা | ১০ - ১৬ জুন ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

প্রতিবাদে প্রতিরোধে

জেল ভরার ডাক এস ইউ সি আই (সি)-র

২৯ জুন

লেখাপড়া শিখে, নিয়ম মেনে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে স্কুলে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নিতে চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মেধাবী যুবক-যুবতী আজ প্রতারিত। তাঁদের প্রাপ্য চাকরির নিয়োগপত্র পিছনের দরজা দিয়ে হাসিল করে ফেলেছেন মন্ত্রী-নেতাদের কন্যা-পুত্র-স্বজন এবং দলীয় 'সম্পদ'রা, অথবা দুর্নীতিচক্রের হাতে হাজার হাজার টাকার প্রণামী গুঁজে দেওয়া অযোগ্য প্রার্থীর দল। নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিয়ে যাঁরা স্বচ্ছতার সঙ্গে এই পেশায় আসার স্বপ্ন দেখছিলেন, প্রতারিত তাঁরাও। সেখানেও চলেছে নিয়োগে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ। পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়েও জালিয়াতির অভিযোগ। এ যেন বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারির নতুন সংস্করণ! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলছেন সিপিএম আমলে নিয়োগ নিয়ে যে স্বজনপোষণ দলবাজি চলত, তার পরিবর্তন দূরে থাক, তা আরও তীব্র আকার নিয়েছে। সারা দেশেই সরকারের গদি আর দুর্নীতির পাঁক যেন এক হয়ে গেছে আজ।

এদিকে সারা ভারতেই বেকারত্বের জ্বালায় আজ প্রায় প্রতিটি পরিবার। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের একচেটিয়া মালিক তোষণকারী নীতির কল্যাণে বেকারত্বের হার সব সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেকদূর এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের কর্মক্ষম মানুষের অর্ধেকের বেশি কর্মহীন। যেটুকু কাজ আছে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই রাজ্যে রাজ্যে সব সরকার বলে দিচ্ছে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী নিয়োগই চলবে। মিলবে না পুরো বেতন, কোনও সামাজিক সুরক্ষা। সরকারের কাজ ক্রমাগত চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। ফলে সরকারি দপ্তরে নতুন নিয়োগ দূরে থাক ক্রমাগত পদ বিলোপ করে চলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই। কেন্দ্রীয় সরকার রেল, এয়ার ইন্ডিয়া, এলআইসি, বিপিসিএল-এর মতো লাভজনক সংস্থাকে বেচে দিচ্ছে একচেটিয়া মালিকদের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বৃহৎ পুঁজিমালিকদের হাতে বেচে দিতে চাইছে সরকারি স্কুল, হাসপাতাল। এখন জনগণের পয়সায় তৈরি জাতীয় সড়ক এবং বড় বড় সেতুর টোল আদায়ের অধিকার পাচ্ছে কর্পোরেট সংস্থা। সারা দেশে বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি মিলে কত লক্ষ সরকারি পদ যে খালি তা কখনও তারা সুনির্দিষ্টভাবে বলে না। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরেই সংখ্যাটা ২৪ লক্ষের মতো। এর মধ্যে নতুন করে রেলে ৮০ হাজার পদ বিলুপ্ত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গে ১.৫ লক্ষ শিক্ষক

দুয়ের পাতায় দেখুন

দাবি

- **এসএসসি ও নার্স নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি**
- **বেকারদের কাজ**
- **বেসরকারিকরণ নীতি বাতিল**
- **সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ**
- **ভোজ্য তেল, ওষুধ জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রদ**
- **চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি**
- **বিদ্যুতের দাম কমানো**
- **নারী নির্যাতন বন্ধ**
- **'দুয়ারে মদ' প্রকল্প বাতিল**
- **জাতীয় শিক্ষানীতি রদ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সমস্ত নীতি বাতিল**

রাজ্যজুড়ে চলছে ২৯ জুন আইন অমান্যের প্রস্তুতি

দুর্বার আন্দোলনের আহ্বান কৃষক সম্মেলনে

১ জুন নদীয়ার দেবগ্রামে জেলা পরিষদের মাঠে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন-এর সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। সমাবেশের আগে তিন হাজারের বেশি কৃষক-খেতমজুরের সুসজ্জিত মিছিল দেবগ্রাম শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে কৃষক ঘরের মহিলা ও যুবকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্লোগান ওঠে—দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করে চাষির কাছ থেকে সরকারকে ফসল কিনতে হবে। মিছিলের সামনে ছিলেন সর্বভারতীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

প্রকাশ্য সমাবেশ। ১ জুন

মিছিল প্রকাশ্য সমাবেশস্থল শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদ নগরে (জেলা পরিষদের মাঠ) প্রবেশ করলে জমায়েতের আকার আরও বাড়তে থাকে। সমবেত জনতা গভীর আগ্রহের সাথে বক্তব্য শোনেন।

প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান। তিনি দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশব্যাপী দুর্বার কৃষক-খেতমজদুর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ও অন্যতম বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতির ফলে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও বেসরকারিকরণে জনজীবন বিধ্বস্ত, সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করতে বিজেপি সরকার চালাচ্ছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আজ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারও কৃষক-শ্রমিক বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে।

চারের পাতায় দেখুন

২৯ জুন
জেল ভরার ডাক এস ইউ সি আই (সি)-র

একের পাতার পর

ও ২ লক্ষের বেশি সরকারি অফিস কর্মচারীর পদ খালি। শোষণে পিষ্ট জনগণের ক্রয়ক্ষমতা যত কমছে তত বাড়ছে বন্ধ কলকারখানা-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কিন্তু সরকারি দপ্তরে নিয়োগ না করতে বদ্ধপরিকর সরকার।

জনজীবনের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রতিদিন প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বেড়ে চলা দাম। শুধু পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে তা নয়, কেরোসিনের দাম লিটারে ৩০ টাকা থেকে বেড়ে বছর খানেকের মধ্যেই ৯২ টাকা হয়েছে। ভোজ্য তেল থেকে চাল-ডাল-আটা-ময়দার দাম যা দাঁড়াচ্ছে তাতে পেট-ভরানোর মতো একটু খাবারের সংস্থানেই নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়ের সবটা ঢেলে দিয়েও কুলোচ্ছে না। এর সাথে আছে ওষুধের দামবৃদ্ধি, চিকিৎসা খরচের বিপুল বৃদ্ধি, শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধির আঘাত। বাড়ছে বিদ্যুতের দাম। গৃহস্থ ঘর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র শিল্প, চাষি সকলেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত।

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশের যে ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল তাকে খতম করার ব্যবস্থা করেছে বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি। আর রাজ্যের তৃণমূল সরকার রাজ্যপালের অসহযোগিতার দোহাই দিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যের চেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্তর থেকে ওঠা ধিক্কারে কান দেওয়ার মতো চক্ষুলজ্জাটাও তারা ঝেড়ে ফেলেছে। অথচ রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা এই ধরনের সরকারি কর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নাক গলাবেন কেন, কোন অধিকারে? সে জবাব রাজ্য সরকার দেয়নি। শিক্ষা পরিচালনা করবেন শিক্ষাবিদরা, শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচিত কোনও বডি তাঁদের সাহায্য করবে, মতামত দেবে। সরকারের কাজ শুধু শিক্ষাকে অবাধ করার জন্য অর্থ জোগান দেওয়া। এ দেশের স্বাধীনতার সময় থেকে ওঠা শিক্ষানুরাগী মানুষের এই দাবিকে সরকারগুলি নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

এ রাজ্যের জেলায় জেলায় চাষিরা ধান নিয়ে মাণ্ডিতে গেলে অফিসাররা ফিরিয়ে দিচ্ছে তাদের। চাষি বাধ্য হচ্ছে নামমাত্র দামে ফড়েদের কাছে ধান বেচতে। অথচ ফড়েরা ওই চাষিদের নামেই মিথ্যা রেজিস্ট্রেশন করে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করছে সরকারকে। পাট বিক্রি নিয়েও চলেছে এইরকম অসাধু কারবার। এ রাজ্যে আলুচাষি, পাটচাষি, পানচাষি থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত চাষের ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিরা ফসলের দাম না পেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। হাজার হাজার চাষি প্রতি বছর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিকে পুরোপুরি একচেটিয়া মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে তিনটি কৃষি আইন এনে আন্দোলনের চাপে আপাতত পিছিয়ে গেলেও নানা কায়দায় একই নীতি চালুর চেষ্টা করে যাচ্ছে। একইভাবে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজ্যের শাসক দল নানা কায়দায় কৃষিকে একচেটিয়া মালিকদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র করে দিতে চেষ্টা করে চলেছে। এর ফলে যেমন মরছে সাধারণ চাষি, একই সাথে এই ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির কারবারের ধাক্কায় বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে ক্ষুদ্র ক্রেতা সকলেই অর্থনৈতিক আক্রমণের শিকার।

গ্রাম-গঞ্জ, শহরে সরকারি দল এবং পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে গড়ে উঠেছে নানা কারবারের অসাধু সিন্ডিকেট। তোলা আদায় থেকে বেআইনি নানা কারবারের সাহায্যে তারা ফুলে ফেঁপে উঠছে। এদের মধ্যে এলাকা দখলের কাড়াকাড়িতে বীরভূমের বগটুইয়ের গণহত্যার মতো ঘটনা বারবার ঘটছে। মাফিয়া আর মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে নারী নির্যাতন প্রতিদিনের ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। বিজেপির শাসনে যেমন উত্তরপ্রদেশে হাথরস, উন্নাও, জম্মুর কাঠুয়ায় গণধর্ষণ এবং হত্যা চলছেই, এ রাজ্যেও হাঁসখালি, বারাসাত, ধূপগুড়ির ভয়াবহ ঘটনার স্রোত থামছে না। পুলিশ প্রশাসন এমনকি সরকারের শীর্ষ কর্তারাও দোষীদের ধরার থেকে ব্যস্ত থাকেন অভিযুক্তদের আড়াল করতে।

প্রতিবাদের মেরুদণ্ড ভাঙতে তৎপর পুলিশ কখনও আনিস খানদের মতো প্রতিবাদী যুবকদের হত্যা করছে, কখনও প্রতিবাদীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেল খাটাচ্ছে। বিজেপি সরকারও যে কোনও প্রতিবাদী মানুষের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে বিনা বিচারে তাদের জেলবন্দি রাখার ব্যবস্থা করছে। একই সাথে কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাকেই মেরে দিতে মদ এবং মাদকের প্রসারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। পূর্বতন কংগ্রেস এবং সিপিএম সরকারও একইভাবে রাজ্যে মদের প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এখন তৃণমূল একেবারে 'দুয়ারে মদ' পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন করছে।

বিজেপি সরকার চেষ্টা করছে মানুষের ক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাসকে উসকে তুলতে। এই লক্ষ্যেই তারা জ্ঞানবাপী মসজিদ, মথুরার ইদগাহ, কুতুব মিনার, টিপু সুলতানের সৌধ, এমনকি তাজমহল নিয়ে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। কখনও হিজাব বিতর্ক কখনও আজান দেওয়া নিয়ে অবান্তর বিতর্ক তুলে সংঘ পরিবার-বিজেপি এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির বাতাবরণকে নষ্ট করতে চাইছে। খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ভাঙাই তাদের উদ্দেশ্য।

বিদ্যুতের দাবি, শিক্ষার দাবি, চিটফান্ড প্রতারিতদের দাবি, চাষির দাবি, শ্রমিকের দাবি— কোনও না কোনও ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের আন্দোলন একটা দিনও থেমে নেই। এই আন্দোলন করতে করতেই ২৯ জুন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আইন ভেঙে জেল ভরানোর ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)

একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রেও অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে সিলেবাসে ঢোকাতে।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন—এর থেকে কি মুক্তির রাস্তা নেই? বিজেপি সরকারকে ভোটে বদলে আর একটা দলকে আনলেই কি পরিস্থিতি বদলাবে? ২০১৪ সালে কংগ্রেস ঠিক একই ধরনের কাজগুলো করছিল বলেই তো মানুষ বদল চেয়েছিল। তার সুযোগে মসনদ দখল করেছে বিজেপি। একচেটিয়া মালিকদের বিশ্বস্ত সেবাদাস একটা দলের বদলে আর একটা দলকে সরকারে বসালেই যে মূল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না তা কংগ্রেস এবং বিজেপির ভূমিকা দেখলেই আজ স্পষ্ট। রাজ্যের ক্ষেত্রেও তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে অন্য আর একটা দলকে ভোটে জেতাও— এ ডাক কোনও সমাধানের পথে নিয়ে যায় না।

সমাধান একটা রাস্তাতেই আছে, তা হল গণআন্দোলনের রাস্তায় চলতে চলতে জনগণের বিকল্প শক্তি গড়ে তোলা। এই রাস্তায় চলতে গিয়ে ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলে সে সরকারকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সে সরকারকে টিকতে না দিলে জনগণই রুখে দাঁড়ায়, তারা এই রাষ্ট্রের স্বরূপ চেনে, সমাজবদলের পথে চলার শক্তি অর্জন করে। শেষ পর্যন্ত এই বুর্জোয়া সমাজটাকে পাল্টানোর পথে এগিয়ে যায় মানুষ। এ কাজ করবে কারা? করতে পারে একমাত্র যথার্থ একটা বামপন্থী শক্তি। বামপন্থার কথা বলব, অথচ ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসের মতো জনবিরোধী শক্তি অথবা জাতপাতের কারবারি কোনও দলের সাথে বোঝাপড়া করে ক'টা সিট বাগানো যায় সেই চেষ্টা যারা করে, সেই দলের পক্ষে যথার্থ গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যে কারণে সিপিএম আজ কোনও আন্দোলনেই নেই।

এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সঠিক বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। সিপিএম সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই দল যেমন আন্দোলন করে বহু দাবি আদায় করেছে, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই দলের ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। হয় কোনও ফ্রন্ট বা ফোরামের মাধ্যমে, না হলে সরাসরি দলের পতাকা নিয়ে চলছে একের পর এক আন্দোলন। বিদ্যুতের দাবি, শিক্ষার দাবি, চিটফান্ড প্রতারিতদের দাবি, চাষির দাবি, শ্রমিকের দাবি কোনও না কোনও ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের আন্দোলন একটা দিনও থেমে নেই। এই আন্দোলন করতে করতেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আন্দোলনের এক নতুন স্তর। ২৯ জুন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আইন ভেঙে জেল ভরানোর ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষ বিশেষত বামমনস্ক সকলের কাছে আহ্বান— এই আন্দোলনের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড তুলসী গোস্বামী ৩ মে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

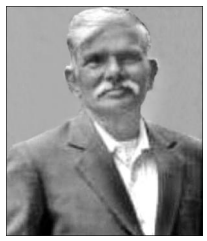

কমরেড তুলসী গোস্বামী ১৯৬০-এর দশকে ছাত্রাবস্থায় দমদম এলাকায় থাকার সময়ে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। '৮০-র দশক থেকে তিনি যাদবপুর সরকারি আবাসনে বসবাস শুরু করেন এবং যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর দুই ভাই কমরেড বিমল গোস্বামী ও কৃষ্ণ গোস্বামী আগেই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও সাহচর্য কমরেড তুলসী গোস্বামীকে দলে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

কমরেড গোস্বামী ছিলেন শান্ত, ধীর-স্থির মধুর স্বভাবের। কমরেডদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, আবেগ, বিশেষত কনিষ্ঠ কমীদের প্রতি স্নেহ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সংগঠক হিসাবে অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসার সময়েই নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতেন। দলের কাজকর্মের খবর রাখা, দলের পত্র-পত্রিকা পড়ায় তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করার কথা ভাবতে তিনি কষ্ট পেতেন। দলের আদর্শের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

কমরেড তুলসী গোস্বামী লাল সেলাম

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, স্পষ্ট বুঝছেন চা শ্রমিকরা

সকালবেলা চায়ের কাপ হাতে অধিকাংশ মানুষেরই দিন শুরু হয়। এই চা তৈরি হয় উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল এলাকায়। পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ চা-বাগিচায় ঘেরা ডুয়ার্সের অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কিন্তু যে মানুষগুলি ওই বাগানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন, তাদের জীবন কাটে নিতান্তই অন্ধকারে। তাদের বাঁচার মতো মজুরি নেই, ন্যূনতম পুষ্টিকর খাবার নেই, চিকিৎসা-শিক্ষার যথাযথ সুযোগ নেই। লুটেরা বাগান-মালিক আর পেটোয়া সরকারের যোগসাজশে, ক্ষমতালোভী ট্রেড ইউনিয়নগুলির কিছু নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় সহজ-সরল লক্ষ লক্ষ চা-শ্রমিক চরম শোষণ-বঞ্চনার জীবন কাটাচ্ছেন।

অমানুষিক বঞ্চনার জীবন

জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা-বাগান ঘুরে সেই ছবিই চোখে পড়ল। তিলাবাড়ি ডিভিশনের বড়দিঘি চা বাগানে কাজ করছিলেন সীমা টুডু, রোজলে খারিয়ারা। শীর্ণ শরীরে অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। বললেন, সকাল ৭টায় কাজ শুরু হয়। দিনে অন্তত ২৫ কেজি চা-পাতা তুলে মালিকের ঘরে জমা দিতে হয়— তবেই মেলে ২০২ টাকা। এর বেশি পাতা তুলতে পারলে কেজি পিছু ৩ টাকা করে মেলে। প্রশ্ন করলাম, ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই টাকায় সংসার চলে? করুণ চোখে অসহায় হাসি মুখে পাল্টা প্রশ্ন তাঁদের— তাই কখনও চলে?

—তাহলে?

—ওই সরকারি রেশনের চালটুকু পেলে, কচুপাতা আর ঢেঁকিশাক তুলে কোনও রকমে চালাই।

রেণু ছেত্রীর তিন ছেলেমেয়ে। স্বামী টিবিতে ভুগছেন। অসুখ-বিসুখ হলে কোথায় চিকিৎসা করান? বললেন, বাগানের একটা ডিস্পেনসারি আছে, কিন্তু সেখানে ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র পর্যন্ত নেই। তা হলে কী করেন? — ওই একজন কম্পাউন্ডারবাবু আছেন। তিনিই দেখেন। প্রশ্ন করলাম, বাগান মালিক থাকার কোয়ার্টার দেয়? রক্তাল্পতার ছাপ মাখা মুখে করুণ হেসে রেণু জানালেন, ঘরের টিনের চাল ফাটা, দরজা ভাঙা আজ দু'বছর। মালিক সারিয়ে দেয় না। বললেন, আগে বাগান থেকে লকড়ি দিত, জ্বালানি দিত, এখন সেসবও বন্ধ। তাঁদের কথায়, আমরা ছোটা আদমি, আমাদের কথা শুনবে কে?

যাওয়া হয়েছিল নেপুচাপুর বাগানে। শ্রমিক রজনী ওরাওঁ বললেন, 'বছরে তিন মাস কোনও কাজ থাকে না। আয়ও বন্ধ। গত ছ'বছর ধরে কাজ করছি। স্বামী ও আমার মজুরি মিলে পাই ৪০৪ টাকা। তা দিয়ে সন্তানদের নিয়ে শুধু খাবারের সংস্থানটুকুও হয় না। অন্য প্রয়োজন মেটানো তো দূর অস্ত। চা-শ্রমিকদের ইউনিয়ন আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বললেন, মাঝে মাঝে মিটিং হয়। কিন্তু ইউনিয়ন নেতারা আমাদের হয়ে মালিককে আদৌ কিছু বলে কি না বুঝতে পারি না।

মুনাফালুটের নেশায় বাগানগুলিকে ছিবড়ে করে দিচ্ছে মালিক

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসকরা ডুয়ার্স অঞ্চলে চা চাষ শুরু করে। কাজ করানোর জন্য ছোটনাগপুর, দণ্ডকারণ্য, মালকানগিরি থেকে তারা নিয়ে এসেছিল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ মানুষদের। এখনও চা বাগানগুলিতে কাজ করে চলেছেন তাঁদের বংশধররা। স্বাধীনতার পর ভারতীয় পুঁজিপতিরা মুনাফার লোভে হাত বাড়ায় চা বাগানের দিকে। ইতিমধ্যে সেখানে শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা বহু উদ্বাস্তু মানুষ। এসেছেন নেপালিরা। সেই সময় আন্দোলনের চাপে বেশ কিছু অধিকার সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শ্রমিকরা। ১৯৫১ সালে তৈরি হয়েছে প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট, ১৯৫৬ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যান্টেশন লেবার রুলস। এইসব আইন শ্রমিকদের জন্য নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা। বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল প্রাপ্যের। বাগান শ্রমিকদের পানীয় জল, চিকিৎসা, শৌচাগার সহ থাকার জায়গা, সন্তানদের পড়াশোনার জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করা মালিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

বড়দিঘি বাগানে চা-শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছেন গণদাবীর প্রতিনিধিরা

ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। আজ এই অঞ্চলের বহু চা বাগান বন্ধ। যেগুলি চলছে সেগুলিও রুগ্ন, দুর্দশাগ্রস্ত। শ্রমিকদের আইনি পাওনাগুলি ঠিকমতো দেওয়া দূরের কথা, মুনাফা লুটের নেশায় বাগান রক্ষণাবেক্ষণের খরচটুকু করতেও রাজি নয় মালিকরা। বহু জায়গায় বাগানের ম্যানেজার শ্রমিকদের বোঝায়— মালিকের তেমন লাভ হচ্ছে না, লাভ না হলে বাগান বন্ধ হয়ে যাবে। এই বলে কম মজুরি নিতে বাধ্য করে। পেটোয়া ইউনিয়ন মালিকের পাশে দাঁড়ায়। কোনও শ্রমিক প্রতিবাদ করলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরিয়ে দেওয়া হয়। চা-বাগানে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নগণ্য, নিয়োগ প্রায় হয় না। কারণ তাদের আইনি প্রাপ্য দিতে নারাজ মালিকরা। তাই নিয়োগ হয় চুক্তির ভিত্তিতে। চুক্তি-শ্রমিকের প্রতি মালিকের বহু দায়ভার আইনের খাতাতেই নেই। যেটুকু রয়েছে তাও দেয় না মালিক। ফলে চুক্তি-শ্রমিক মায়েদের সন্তান দেখার ব্যবস্থা নেই, নেই রেশন, নেই অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা। আগে বাগানে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল। এখন শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

ন্যূনতম মজুরি পায় না চা শ্রমিক

বহু বছর আগে, ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনন্দিন ২৭০০ ক্যালোরি শক্তিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সেইমতো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত নানা নির্দেশ দিয়েছে। দেশে একের পর এক সরকারের বদল হয়েছে। কিন্তু চা শ্রমিকদের হাল ফেরেনি। বারবার আন্দোলনে নেমেছেন শ্রমিকরা। জেলার লেবার কমিশনার, উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন উত্তরকন্যা, পূর্বতন ও বর্তমান শ্রমমন্ত্রীর কাছে শ্রমিকরা বারবার দরবার করেছেন, কিন্তু সরকার তাঁদের দাবি মানেনি। উত্তরবঙ্গ জুড়ে শ্রমিকরা বহুবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছেন। পুলিশের লাঠির ঘা মিলেছে, মজুরি বাড়েনি। পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে যেমন, বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও তেমন, বারবার মালিক-সরকার-শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু মালিকরা কোনও মতেই মজুরি বাড়াতে রাজি হয়নি। কোনও সরকারই মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মজুরি বাড়াতে বাধ্য করেনি। বাধ্য করেনি জল-বিদ্যুৎ-কোয়ার্টার-চিকিৎসার মতো প্রাপ্য পরিষেবাগুলি শ্রমিকদের দিতে। তার বদলে, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের শেষে, কখনও ১৭ টাকা, কখনও ৩ টাকা মজুরি বাড়িয়ে শ্রমিক দরদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। সম্প্রতি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে তৃণমূল সরকারের শ্রমমন্ত্রী লজ্জার বালাই না রেখে মালিকের কথা ভেবে শ্রমিকদের কম মজুরি মেনে নিতে বলেছেন। বাগান-মালিকরাও এই ধরনের নেতা, ইউনিয়নগুলিকেই খোঁজে। বাড়তি সুবিধা দিয়ে তাদের হাতে রাখে। তারা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করে— আন্দোলন করে কিছু হবে না, মালিক না থাকলে আমরা খাটব কোথায়, খাব কী! ফলে যা দিচ্ছে মেনে নাও। বহু জায়গায় তিন দিনের মজুরি দিয়ে ছ'দিনের কাজ করিয়ে নেওয়া হয় সরল, উদার-হৃদয় এই মানুষগুলিকে দিয়ে। অশিক্ষিত, অসচেতন শ্রমিক ভাবে— এ সব কপালের লিখন। বংশপরম্পরায় চা বাগানই যাদের ঘরবাড়ি, সেই শ্রমিকরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে মালিকি শোষণের পেষাই কলে নিজেদের নিংড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে চা বাগানের শ্রমিকরা আজও অকল্পনীয় কম মজুরিতে অমানুষের জীবন যাপন করে চলেছেন। তাঁদের মজুরি এমনকি বিড়ি শ্রমিক বা কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির চেয়েও কম।

তিলে তিলে মরছে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বন্ধ চা বাগানের যন্ত্রণা। ১৯৯০-এর দশক থেকে ডুয়ার্স অঞ্চলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হতে শুরু করে। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা ও বেতন বাকি রেখে, আগে নেওয়া বিপুল ঋণ শোধ না করে আচমকা কারখানা বন্ধ করে দিয়ে রাতারাতি মালিক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কাজ হারিয়ে অনাহারে, অখাদ্য খেয়ে মারণ আন্ত্রিকে ভুগে মরতে থাকেন চা শ্রমিকরা। যাঁরা কোনও রকমে টিকে গেলেন, মালিকি জুলুম আর সরকারি অবহেলায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ থাকে না তাঁদের। সুযোগ পেয়ে মাথাচাড়া দেয় নারী ও শিশু পাচারের ব্যবসা। দলে দলে তরুণ কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে, ভিন দেশে পাড়ি দেয়। শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিকের যন্ত্রণাময় জীবন।

এমনই এক বন্ধ চা-বাগান—জলপাইগুড়ির রায়পুর চা বাগানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৮-১৯ বছর বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে একসময়ের বিখ্যাত এই বাগান। আপাতত একটি কমিটি তৈরি হয়েছে যারা বাগানের ছোট একটি অংশে পাতা তোলার কাজ চালাচ্ছে। পাতা বিক্রি করে যা পাওয়া যাচ্ছে, শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ বাগানে গিয়ে অজস্র শীর্ণ, রুগ্ন, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত মহিলা শ্রমিকের দেখা মিলল। সারি দিয়ে বসে আছেন তুলে আনা পাতা ওজন করাবেন বলে। পাতা তুলে কোনও দিন ৫০ টাকা, কোনও দিন ৬০ টাকা মজুরি মিলছে। ভুতুড়ে বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ভগ্নপ্রায় কারখানা-বাড়ি। তার গা বেয়ে এলাকার খেটে-খাওয়া মানুষের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুলের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে চিমনির নল। আজ আর সেখান দিয়ে চায়ের গন্ধ মাখা ধোঁয়া বের হয় না। শ্রমিকদের থাকার জায়গায় গিয়ে দেখা গেল জঙ্গল থেকে শাকপাতা এনে ফুটিয়ে খাবারের জোগাড় করছেন মহিলারা। জল-বিদ্যুতের লাইন বহুদিন কাটা। শ্রমিকদের বসবাসের কোয়ার্টার কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। ঝোপ-জঙ্গল-আগাছায় ছেয়ে গিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভুতুড়ে বাড়ির রূপ নিয়েছে। স্কুলের কথা না বলাই ভাল, টিনের শেড চুঁইয়ে বর্ষায় জল পড়ে। মিড-ডে মিলের দু-মুঠো খাবারের জন্য শ্রমিক পরিবারের অপুষ্ট, শীর্ণকায় শিশুরা উন্মুখ হয়ে থাকে। চা-শ্রমিক অনন্ত চিকবড়াইক

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে কৃষক বিক্ষোভ

এমএসপি আইনসঙ্গত করা, কৃষিতে কম দামে বিদ্যুৎ সহ নানা দাবিতে মধ্যপ্রদেশে অশোকনগরের আম্বেদকর পার্কে ৩০ মে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে কৃষক বিক্ষোভ

স্থায়ীকরণের দাবি ব্যাঙ্ককর্মীদের

২৮ মে কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে এসবিআই-এর হাউসকিপিং স্টাফদের (কনট্র্যাকচুয়াল) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এসবিআই স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও সিবিইইউএফ (এআইইউটিইউসি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড নারায়ণ পোদ্দার বক্তব্য রাখেন। তিনি কনট্র্যাক্ট কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কৃষক সম্মেলন

একের পাতার পর

এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেশের জনগণের সামনে এক নতুন দিশা তুলে ধরেছে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কমরেড রঘুনাথ দাস, সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স। সভা শেষে 'কর্পোরেট হটাও দেশ বাঁচাও' এই শিরোনামে দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে একটা মাইম শো অনুষ্ঠিত হয়।

২-৩ জুন প্রতিনিধি অধিবেশন হয়। অধিবেশন সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড মদন সরকার। সম্মেলন থেকে কমরেড পঞ্চানন প্রধানকে সভাপতি, কমরেড মদন সরকার সহ পাঁচ জনকে সহসভাপতি ও কমরেড গোপাল বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ৪৮ জনের রাজ্য কমিটি ও ৩৮ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৩ জুন রাজ্যের ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

এআইকেকেএমএস-এর প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে চাঁচলে বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জঘন্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত রাজ্যের তৃণমূল সরকার। ছ'শোর বেশি নিয়োগ ইতিমধ্যে বাতিল করেছে হাইকোর্ট। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মালদহ জেলায় এসইউসিআই(সি)-র চাঁচল ইউনিট ১ জুন নেতাজি মূর্তির পাশে বিক্ষোভ দেখায়।

বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নেতা কমরেড ঝন্টু রবিদাস ও সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার। এছাড়াও কমরেডস রকিব হোসেন, কালীচরণ রায়, উজ্জ্বলেন্দু সরকার প্রমুখ নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে শিক্ষাবিদদের নিয়োগ সহ অন্যান্য দাবিতে বক্তব্য রাখেন।

৩৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক ৭০০০ টাকা ভাতা সহ অন্যান্য দাবিতে ১ জুন হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন জেলা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও দাবিপত্র পেশ করে

এআইডিএসও-র ক্রীড়া কর্মশালা

এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল সেল্ফ ডিফেন্স ও ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। শিবিরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের গোল্ডেন বেবি লিগ অপারেটর ভূপেন পাল এক মনোজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে কী ভাবে শিশু কিশোরদের খেলাধূলা তথা ফুটবল খেলার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি ছোটদের কী ভাবে ফুটবল প্রশিক্ষণ দিতে হয় তা হাতে-কলমে করে দেখান। খেলার মাধ্যমে কী ভাবে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে এবং ভালো মানুষ হিসাবে তাদের গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও ভূপেনবাবু আলোচনা করেন।

অন্য দিকে সমাজ জুড়ে যেভাবে নারী নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। শিশু-কিশোরদের মোবাইল আসক্তি দূর করতে এআইডিএসও-র উদ্যোগে রাজ্যের প্রতি প্রান্তে তাদের খেলাধূলায় আকর্ষণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মনীষীদের জীবনচর্চার পরিকল্পনা করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী, এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, কমরেড বিশ্বরঞ্জন গিরি ও কমরেড আবু সাঈদ। প্রতিটি জেলায় শিশু-কিশোরদের নিয়ে খেলার মাঠ পরিচালনা করতে করতেই ভারতের কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পালের স্মৃতিতে ক্লাব গঠন করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়।

রেলে ৮০ হাজার পদ বিলোপ যাত্রী স্বার্থকে বিপন্ন করবে

রেলে ৮০ হাজার পদ বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ১ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, শুধু চিহ্নিত ৮০ হাজার পদই নয়, 'নন সেফটি' ক্যাটেগরির প্রায় সমস্ত পদ সহ সব স্তরেই বিপুল সংখ্যক পদ অচিরেই তুলে দেওয়া হবে। কিছু কিছু বিভাগের অধিকাংশটাই বিলুপ্ত হতে পারে। রেল শিল্প এতবড় আক্রমণের সামনে এর আগে পড়েনি। তিনি বলেন, ট্রেন ও স্টেশনের সংখ্যা, যাত্রী সংখ্যা, মালগাড়ি ও মাল পরিবহণের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়ালেও রেলে সাড়ে বাইশ লাখ কর্মচারীর সংখ্যা এখন কমে ১২ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এমনকি স্টেশন মাস্টার, রেল কো-পাইলট, গার্ডের মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছেছে। যাত্রী এবং কর্মচারী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রেল বেসরকারিকরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, একচেটিয়া মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে বিজেপি সরকার কংগ্রেসের থেকেও বেশি আগ্রাসী হয়ে বেসরকারিকরণের পথে যাচ্ছে।

এর ফলে রেলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষ উভয়ের জীবন-জীবিকার উপর মারাত্মক আঘাত আসবে। কর্মসংস্থান কমবে, রেল কর্মচারীদের কাজের বোঝা বাড়বে, সর্বোপরি রেলের সামাজিক দায়িত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে, রেল ভাড়া ও পণ্য মাশুল ব্যাপক হারে বাড়ার ফলে সব জিনিসের দাম বাড়বে। কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত দল নির্বিশেষে সমস্ত রেলকর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মেটানোর দাবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস ২০ মে এক বিবৃতিতে বলেন, মহার্ঘভাতা সম্বন্ধে স্যাটের রায় কার্যকর না করে রাজ্য সরকার বিষয়টিকে বিলম্বিত করা এবং সম্ভব হলে আদৌ কার্যকর না করার উদ্দেশ্য নিয়ে সময় নষ্ট করছে। অবশেষে আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা মিটিয়ে দেওয়ার যে রায় কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছে তিনি সেই রায় মেনে অতি দ্রুত তা কার্যকর করার দাবি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহার্ঘ্য ভাতা যে অতিরিক্ত বেতন নয় বরং সরকারেরই উপযুক্ত ভূমিকার অভাবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সরকার প্রতিশ্রুত বেতনের যে অবক্ষয় তার ক্ষতিপূরণ এবং সে কারণেই তা কর্মচারীদের আইনসঙ্গত অধিকার, এই বিষয়টিও এই রায়ে প্রতিষ্ঠিত।

সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যু ঃ অনির্বাচিত ছাত্র সংসদের অপকর্মের দায় নিতে হবে রাজনৈতিক অভিভাবকদের

৩১ মে গুরুদাস কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ (কেকে) -এর আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, সারা রাজ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনির্বাচিত ও অগণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনা করতে গিয়ে শাসক দল ও তার ছাত্র সংগঠন কী পরিমাণ দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা ও বেলাগাম ক্রিয়াকলাপের জন্ম দিচ্ছে, এই ঘটনা তা সামনে এনে দিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠিত না হলে, কার্যত শাসক দলের ছাত্র সংগঠনই স্বৈরাচারী ভাবে অনির্বাচিত সংসদ পরিচালনা করে যাবে। স্বভাবতই এদের কোনও দায়বদ্ধতা ছাত্রছাত্রী বা সমাজের প্রতি থাকতে পারে না। এর পরিণামে এমন ঘটনা ঘটল। কলেজগুলির অনুষ্ঠান আয়োজনের বিপুল আর্থিক উৎস কী, গতকালের ঘটনায় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিজস্ব সংসদ গঠন করার গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। নির্বাচিত ছাত্র-সংসদ যাতে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ অন্য যে কোনও ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত বিষয় স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনির্বাচিত ছাত্র সংসদগুলির যাবতীয় অপকর্মের দায় শাসক দলের ছাত্রনেতা এবং তাঁদের রাজনৈতিক অভিভাবকদের নিতে হবে।

খড়্গপুর ডিআরএম অফিসে বিক্ষোভ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দিঘা-বেলদা-মেদিনীপুর-খড়্গপুর-আমতা-ঝাড় গ্রাম-হলদিয়া লাইনে অতিমারির প্রকোপ শুরু হওয়ার আগে ১৯১টি ট্রেন চালানো হত, বর্তমানে ১৫৬টি ট্রেন চালানো হচ্ছে। সমস্ত ট্রেনগুলি অবিলম্বে চালু, প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিকে এক্সপ্রেস ট্রেনে রূপান্তরিত করে ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, প্রবীণ নাগরিক ও অসুস্থ যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে আগের মতো কনসেশন চালু এবং রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণ ও কর্মী সংকোচনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ২৭ মে খড়্গপুর ডিআরএম অফিসে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে শাখা কমিটির পক্ষে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের আরও দাবি, পুনর্বাসন ছাড়া রেল পার্শ্বস্থ দোকানদারকে উচ্ছেদ করা চলবে না। এক্সপ্রেস ট্রেনে জেনারেল বগি যুক্ত করতে হবে এবং লোকাল ট্রেন টিকিট ও মান্থলি টিকিটে যাতায়াতের সুযোগ রাখতে হবে। বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি মধুসূদন বেরা, যুগ্ম সম্পাদক সুরঞ্জন মহাপাত্র এবং সরোজ মাইতি। প্রতিনিধিদল ডিআরএম অফিসে স্মারকলিপি দেন।

নিকাশির দাবিতে পানিহাটিতে আন্দোলন

পানিহাটি জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে ১ জুন পর্যাপ্ত পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সহ নানা দাবিতে পৌর প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদক নিতাই ব্যানার্জি, সভাপতি রমেন্দ্র নাথ মালাকার এবং ডাক্তার স্বপন বিশ্বাস।

৩১ মে পর্যন্ত আগরপাড়া মহাজাতি মোড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৮ শতাধিক মানুষ স্বাক্ষর দেন দাবিপত্রে। পানীয় জলের সমস্যা চলছে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল সরবরাহের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনা, মহাজাতি মোড় থেকে বিটি রোড পর্যন্ত বেহাল আগরপাড়া স্টেশন রোডের দ্রুত মেরামত, জমা জলের সমস্যা দূর করতে বর্ষার আগে নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি জানানো হয়। নাগরিকদের সচেতন করতে তাদের জলের অপচয় বন্ধ করা এবং প্ল্যাস্টিক ব্যবহার বন্ধকরার আবেদন জানানো হয়েছে। রাস্তা মেরামত, পানীয় জল ও নিকাশির সুষ্ঠু সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন পৌরপ্রধান। না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানিয়েছে সংগঠন।

নদী পারাপারের টোল ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ

ঘাটালে শিলাবতী নদীর সাহেবঘাটে শহিদ ক্ষুদিরাম সেতু (কাঠের ব্রিজ) পারাপারের জন্য সম্প্রতি টোল ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি। প্রতি মোটরসাইকেল পূর্বে ছিল ৪ টাকা। বর্তমানে হয়েছে ৫ টাকা। প্রতি ট্রলি পূর্বে ছিল ২০ টাকা, বর্তমানে হয়েছে ২৫ টাকা। প্রতিবাদে ৩০ মে ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করে কমিটি। নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক কানাইলাল পাখিরা ও ঝাড়েশ্বর মাজী প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

২০০২ সালে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি তৈরি হয়। ২০১৩ সালে বিধ্বংসী বন্যায় ব্রিজটি ভেঙে যায়। এরপর ২০১৪ সালে নতুন করে ব্রিজ তৈরি করে এলাকার কয়েকজন বিত্তশালী ব্যক্তি। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে তারা টোল ট্যাক্স আদায় করা শুরু করে এবং ২০১৬ ও ২০২০ সালে ফের ট্যাক্স বাড়ায়। বর্তমান করোনা মহামারীতে যখন মানুষজনের দুর্বিষহ অবস্থা, ঠিক সেই সময় আবার ২০২২ সালে ওই মালিকরা উপরোক্ত ট্যাক্স বাড়ানোয় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কমিটির দাবি, ব্রিজটি ব্লক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করুক এবং বিনা পয়সায় পারাপারের বন্দোবস্ত করুক। যত শীঘ্র সম্ভব কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি করা হোক।

হুগলিতে ছাত্র সভা

এআইডিএসও হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ মে চুঁচুড়া শহরের কিশোর প্রগতি সংঘ হলে 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি না' এই বইটির উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সভায় অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা।

ব্যারাকপুরে ছাত্র সম্মেলন

২৯ মে উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটিতে সমরেশ বসু কক্ষে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন। উদ্বোধন করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন এআইডিএসও-র প্রথম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল।

প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চন্দন সাঁতরা। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অতীশ বোস। সম্মেলনে ৭৩ জন ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে কমরেড অভিষেক দেবনাথকে সভাপতি, কমরেড সুকান্ত পাত্রকে সম্পাদক করে ১১ জনের জেলা কমিটি ও ১৩ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

হেলথ গাইডদের স্মারকলিপি

স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা, ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকা, অবসরকালীন পেনশন ভাতা, গ্র্যাচুইটি দেওয়া, মৃত ও অক্ষম পোষ্যের চাকরির দাবিতে ১ জুন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিউনিটি হেলথ গাইড ইউনিয়নের নেতৃত্বে হেলথ গাইডরা স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেন।

বহু বছর আগে সিএইচজি ও টিডি কর্মীরা মাসিক মাত্র ৫০ টাকা পারিশ্রমিকে স্বাস্থ্যদপ্তরে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সিএইচজি কর্মীরা নানা রকমের ওষুধ, ওআরএস নিয়ে গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষদের সেবা করতেন, অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতেন। ২০১৩ সালের পর থেকে এঁদের কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যদপ্তরে বারবার দাবি জানানোয় পারিশ্রমিক সামান্য বেড়ে সিএইচজি কর্মীদের মাসিক ৪০০ টাকা ও টিডি কর্মীদের ৫৫০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন এই স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেজন্য বাধ্য হয়ে আবারও তাঁরা আন্দোলনের রাস্তাই বেছে নিয়েছেন।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে চা শ্রমিকদের

তিনের পাতার পর

রিকেটগ্রস্ত সন্তান কোলে দুর্দশার কথা জানালেন। বললেন চালের টিন ভাঙা। ঝড়বৃষ্টিতে ত্রিপল মাথায় দিয়ে কোনওরকমে দিন কাটাতে হয়। নিকাশির জঘন্য দশা। ফলে মশা-মাছির ব্যাপক উপদ্রব। একদিন অন্তর স্ত্রী বাগানে কাজ করে পান মাত্র ৪০-৫০ টাকা। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক লক্ষ্মী মুণ্ডার পরিবারে সাত সাতটি পেট, দিন চলে না। হাড় ক'খানা সম্বল। বললেন, বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ। অসুখ হলে দেখানোর জায়গা একমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেখানেও ওষুধ মেলে না।

শ্রমিকের প্রতি নির্মম, মালিকের প্রতি সদয় সরকার

চা ব্যবসায় মন্দার কথা বিশেষ শোনা যায় না। তবু কেন বন্ধ হচ্ছে চা বাগান? কথা হল রায়পুর বাগানের একসময়কার শ্রমিক মালু ওরাওঁয়ের সঙ্গে। বাগান বন্ধ হওয়ার আগে উনি ছিলেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত চা শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রায়পুর বাগান ইউনিটের সম্পাদক। তাঁর কথায় উঠে এল মালিকের মুনাফা-লালসার পাশাপাশি সরকার-মালিক যোগসাজশের বীভৎস চিত্র। জানা গেল, চা বাগানের জমির মালিকানা বাগান-মালিকের নয়। এ জমি সরকারের কাছ থেকে তারা লিজ নেয়। চা পাতার দাম নির্ধারিত হয় যে নিলাম-বাজারে সেখানে ব্রোকারদের সাথে যোগসাজশ থাকে মালিকদের। মালিকের নিজের লোকই ঘুরপথে কম দামে পাতা কিনে নেয়। এরপর নিলামে চা-পাতার দাম উঠছে না বলে সরকারের কাছে লোকসানের কাঁদুনি গাওয়া শুরু করে। এভাবে শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর দাবি খারিজ করে দেয় মালিকরা। কারখানা বাঁচাতে সরকারি অনুদান চায়। এদিকে দ্রুত মুনাফা লুটের লোভে বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে মাথা ঘামায় না মালিক। পাশাপাশি বাগান উন্নয়নের নামে ব্যাঙ্ক থেকে মাঝে মাঝেই তারা বিপুল টাকা ঋণ নেয় এবং সেই টাকা অন্য আরও লাভজনক কোনও ব্যবসায় খাটায়। এইভাবে চলতে চলতে যখন ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ, শ্রমিকদের বেতন, পিএফের টাকা ইত্যাদির বকেয়ার পরিমাণ আকাশ ছুঁয়ে ফেলে, ঠিক তখনই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আচমকা বাগান বন্ধ করে মালিক উধাও হয়ে যায়। এদিকে বকেয়া টাকার বোঝা সহ ওই বাগান অন্য ব্যবসায়ীরা কিনতে রাজি হয় না। ফলে দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে একসময়ের রমরমা চা বাগান। আচমকা কাজ হারিয়ে বাগানের ওপর সমস্ত দিক দিয়ে নির্ভরশীল দিশাহারা বাগান-শ্রমিক নিদারুণ দুরবস্থায় পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত বাগান অধিগ্রহণ করে নতুন করে তা চালু করা। শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকলে, রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে ঠিক এই কাজটাই সরকার করত। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারকে এই ভূমিকায় দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, আইন অনুযায়ী বাগান বন্ধ করলেও শ্রমিকদের পানীয় জল ও হাসপাতাল পরিষেবা চালু রাখার কথা মালিকের। মালিকরা তা করে না। অথচ সরকার আজ পর্যন্ত আইনভঙ্গের জন্য একজন মালিকেরও শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। এইভাবে সরকার-মালিকের যোগসাজশে না খেতে পেয়ে, বিষাক্ত খাবার ও জল খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মারা যায় শত শত অসহায় শ্রমিক ও তাদের পরিজন।

পাতা ওজন করানোর জন্য ক্লান্ত শ্রমিকদের দীর্ঘ সারি

শ্রমিকদের প্রতি নির্মমতার এখানেই শেষ নয়। আইন অনুযায়ী আগে শ্রমিকদের রেশন দিতে বাধ্য থাকত মালিক। তৃণমূল সরকারের মালিকপ্রেম এমনই যে, ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে, মালিকের বদলে তারাই রেশনের ব্যবস্থা করবে। এদিকে শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে দেখা গেল, অনেকেরই রেশন কার্ড নেই। ফলে বরাদ্দ সামান্য খাবারটুকুও বহু শ্রমিক পাচ্ছেন না। বহু শ্রমিকের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই। ১০০ দিনের প্রকল্পের মতো সরকারি কাজ প্রায় বন্ধ, যতটুকু হয় তার টাকাও শ্রমিকদের হাতে পৌঁছয় না। চা-বাগান একটানা তিন মাস বন্ধ থাকলে সরকারের পক্ষ থেকে চা-শ্রমিকদের মাসে হাজার টাকা 'ফাউলাই' অনুদান দেওয়ার কথা। বন্ধ রায়পুর চা-বাগানে গিয়ে দেখা গেল, বেশিরভাগ শ্রমিকই ফাউলাই কী তা-ই জানে না। কেউ দু-একবার পাওয়ার পর আর পাননি। 'চা সুন্দরী' প্রকল্পের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের পাকা বাড়ির বিজ্ঞাপন জাতীয় সড়ক কিংবা নানা স্থানে রাস্তার দু'ধারে চোখে পড়ে। কিন্তু এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা দূরের কথা, অনেক শ্রমিক জানেনই না এই প্রকল্পের কথা।

ছোট বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাও তথৈবচ

বাগানের বাইরে রয়েছেন অসংখ্য শ্রমিক যাঁরা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চা-চাষের জমিতে দিনমজুরি করে পেট চালান। এঁদের অবস্থাও তথৈবচ। কাজ হলে দিনে মেলে ১৯৩ টাকা। ফলে অনেককেই অন্য নানা ঠিকা কাজ করে সংসার চালাতে হয়।

অসচেতন করে রাখা হয়েছে চা শ্রমিকদের

মালিকি শোষণ ও সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে চা শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু চা বাগান ঘুরে দেখা গেল, নিজেদের দাবি-দাওয়া-অধিকার, এমনকি নিজেদের সংগঠনের বিষয়েও শ্রমিকরা অত্যন্ত অসচেতন। চা শ্রমিক আন্দোলনের এক সংগঠক জানালেন, ভোটসর্বস্ব দলগুলির শ্রমিক সংগঠন অনেক সময়ই শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে দেয়। বহু ক্ষেত্রেই তাদের নেতারা মুখে শ্রমিকস্বার্থের স্লোগান দিতে দিতে কার্যত মালিকেরই মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলে। শ্রমিকদের দরকার পড়ে শুধু মিছিল সাজাবার জন্য। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের সচেতন করে তোলার কাজ করে চলেছে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন এনবিটিপিইইউ। অবসর নেওয়ার পর দুঃস্থ, বয়স্ক শ্রমিকদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু যাতে মালিক কেড়ে নিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের পাট্টা দেওয়ার দাবিও জোরের সঙ্গে তুলে ধরছে এই সংগঠন।

লড়াই-ই চা শ্রমিকদের বাঁচার একমাত্র পথ

চা শ্রমিকদের গোটা ইতিহাসটাই নির্মম বঞ্চনার ইতিহাস। সেই ব্রিটিশ আমলে বাগান-মালিক আড়কাঠি লাগিয়ে আদিবাসী মানুষদের বাগানে নিয়ে এসে কাজে লাগাত। সামান্য গাফিলতি হলেই তাদের জুটত সাহেবের চাবুক। মালিক, পেটোয়া ম্যানেজার ও বাবু শ্রেণির কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত শ্রমিকরা। অবাধে চলত মহিলা শ্রমিকদের ইজ্জত লুট। বাগানে কাজ করতে এসে দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণার শিকার হতে হত আদিবাসী মানুষগুলিকে। সেই দুঃসহ যন্ত্রণার গুমরে ওঠা কান্না কান পাতলে আজও শোনা যায় তাদের নিজস্ব ভাষায় গানের সুরে সুরে।

স্বাধীনতার পর বাগানের মালিকানা পাল্টে তা এসেছে দেশীয় পুঁজিমালিকদের কাছে। কিন্তু পাল্টায়নি নির্মম শ্রমিক শোষণ, অবিশ্রান্ত লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বাস্তবতা। শ্রমিকের হাড়ভাঙা শ্রম লুট করে মুনাফার পাহাড় বানিয়ে, তাদের সমস্ত আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তাদের ন্যায্য পাওনা পিএফের টাকা অবাধে আত্মসাৎ করে আজও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় মালিক। নির্যাতিত শ্রমিকের আর্তনাদ চাপা পড়ে থাকে মালিকের দামি বুটের তলায়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একের পর এক সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু না কংগ্রেস, না সিপিএম, না তৃণমূল সরকার— কেউই মালিকের এই চরম অন্যায় কোনওদিন চোখে দেখতে পায়নি, এখনও পায় না। এর বিরুদ্ধে বারবার বিক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়েছেন চা শ্রমিকরা। পুলিশ আর মালিকের পোষা দুষ্কৃতীদের মার খেয়ে তাঁরা রক্ত ঝরিয়েছেন বারবার। আজও জারি রয়েছে তাঁদের লড়াই।

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের নিয়ে যুক্ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এনবিটিপিইইউ সহ বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ জয়েন্ট ফোরাম। নানা সময়ে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ, মালিকপক্ষের সঙ্গে বা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত ১৮ দফা দাবি জানিয়ে আসছে তারা। বারবারই মালিক-সরকারের গা ঘেঁষাঘেঁষিতে দাবি আদায়ে ব্যর্থ হতে হয়েছে। কিন্তু লড়াইয়ের রাস্তা থেকে পিছু না হঠার শপথ নিয়েছেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকরা। মার খেতে খেতে মরিয়া শ্রমিক আজ স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছেন, লড়াই-আন্দোলন ছাড়া বাঁচার পথ নেই। আপসহীন সেই লড়াইয়ের পথে উত্তরবঙ্গের চরম দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি করে চলেছে সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন এনবিটিপিইইউ। যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম মজুরি সহ ১৮ দফা দাবি আদায়ে তারা অনড়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দল গড়ে ওঠার একেবারে প্রথম দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এগিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু পরিবারের মহিলা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড অনিতা হালদার। মন্দিরবাজার থানার মুলদিয়া গ্রামে তাঁর পরিবার ছিল দলেরই পরিবার। শত অভাবের মধ্যেও স্বামী-পুত্র কাউকেই দলের কাজ ছেড়ে ব্যক্তিগত কাজে সময় দিতে বলা তাঁর চিন্তারও অতীত ছিল। দলের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃসমা। বৃদ্ধ বয়সে শয্যাশায়ী থাকাকালীনও খোঁজ নিতেন পরিচিত সব কর্মীর।

৩০ জানুয়ারি ৮২ বছর বয়সে কমরেড অনিতা হালদারের জীবনাবসানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক বিপ্লবী যোদ্ধাকে হারাল দল।

কমরেড অনিতা হালদার লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ও দলের সংগঠক কমরেড বিন্দু হালদার ১৫ মে আকস্মিক হৃদরোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

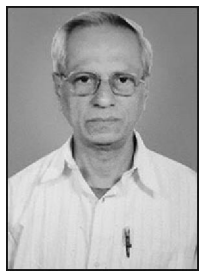

পারিবারিক সূত্রে কৈশোরেই তিনি কমসোমল এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দিয়ে শিক্ষক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। নানা রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি দলের কাজে যথাসম্ভব সক্রিয় থাকার চেষ্টা করতেন। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি অসুস্থ অবস্থায় একটি সভায় যোগ দেন। কমরেড বিন্দু হালদারের মৃত্যুতে দল হারাল এক নিষ্ঠাবান সংগঠককে। ২৯ মে মুলদিয়া লাকি কমপ্লেক্সে কমরেড অনিতা হালদার ও বিন্দু হালদারের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ বিষ্ণুপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড আলাউদ্দিন লস্কর।

কমরেড বিন্দু হালদার লাল সেলাম

জাল নোটের রমরমায় প্রমাণ হল
নোট-বাতিল ছিল এক বিরাট প্রতারণা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে, দেশে এখন জাল নোটের রমরমা। গত এক বছরে দেশে মোট জাল নোট মিলেছে ২,৩০,৯৭১টি। তার আগের বছরে ছিল ২,০৮,৬২৫টি। শুধু পাঁচশো আর দু'হাজার নয়, দুশো থেকে দশ— সব নোটই জাল হচ্ছে।

অথচ নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, এটা কালো টাকা এবং জাল নোটের কারবার সম্পূর্ণ বন্ধকরে দেওয়ার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ২০১৬ সালে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় আচমকা ঘোষণা করে রাত ১২টা থেকে ১০০০ ও ৫০০ টাকার সরকারি নোট বাতিল করে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে দেশের অভ্যন্তরে চলমান সমস্ত কালো টাকার কারবার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ ওই দুটি নোট যার কাছে যত পরিমাণ আছে তা অবিলম্বে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। কালো টাকা অর্থাৎ বেহিসাবি টাকা কেউ ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারবে না। এক ধাক্কায় তা খারিজ হয়ে যাবে। এর ফলে বাজারে চলমান জাল নোটও ধরা পড়ে যাবে। দেশে এখন থেকে কেবল সাদা টাকাই বহাল থাকবে। এর ফলে আর কেউ কর ফাঁকি দিতে পারবে না। আরও বলা হয়েছিল, এর ফলে কালো টাকার মদতে চলে আসা দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধহবে। সাথে সাথে তিনি এও ঘোষণা করেছিলেন, বিদেশে বিপুল পরিমাণ লুকিয়ে রাখা কালো টাকা উদ্ধার করে এনে দেশের প্রতিটি পরিবারের হাতে ১৫ লক্ষ টাকা করে পৌঁছে দেবেন। এই পদক্ষেপের ফলে দেশের এবং দেশের বাইরের কালো টাকার কারবারিদের জায়গা হবে জেল। উনি বলেছিলেন মাত্র ৫০ দিনের মধ্যে এর সুফল প্রমাণিত হবে, না হলে প্রকাশ্য রাস্তায় দেশের জনগণ তাঁকে যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেবেন তিনি।

তারপর ৬ বছর কেটে গেছে। কালো টাকা উদ্ধার হয়নি। একজন কালোটাকার কারবারিও গ্রেফতার হয়নি। অবশেষে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সরকারি তথ্য দেখাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া ওই সব প্রতিশ্রুতি ছিল স্রেফ মিথ্যা। কারণ বাজারে জাল টাকা রমরমিয়ে চলছে এবং তা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা হলে নোট বাতিল করে লাভ কী হল?

সে সময়েই খবরে প্রকাশিত হয়েছিল, নতুন নোট ছাপাতে ও ব্যাঙ্কগুলিতে তা পৌঁছে দিতে সরকারি কোষাগার থেকে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তা ছাড়া, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে বিপুল টাকা জমা পড়েছিল তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সেই সব ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা সুদ দিতে হয়েছিল। তাহলে এত খরচ ও হম্বিতম্বিতে লাভটা কী হল? নোট বাতিলের সময় আরএসএস-বিজেপি বাহিনী প্রচার তুলেছিল, পাকিস্তান ভারতের বাজারে জাল নোট ছেড়ে দেবে জানতে পেরে আগেই মাস্টারস্ট্রোক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাতারাতি পাঁচশো ও হাজার টাকার প্রচলিত নোট বাতিল করে দিলেন। আদতে এর দ্বারা তিনি গোটা দেশের সাধারণ জনতাকে টাকা বদলের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একবার লাইনে দাঁড়ালে সারা জীবনে আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না। কমবে দুর্নীতি। এগোবে দেশ। আরও বলেছিলেন, সীমান্তে দাঁড়িয়ে সেনারা দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, আপনারাও কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়তে ক'দিন লাইনে দাঁড়িয়ে একটু কষ্ট করুন। এই 'একটু কষ্ট' করতে গিয়ে মাস দেড়েকের মধ্যে শতাধিক মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। সেদিন সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জমা পড়া টাকার পরিমাণের হিসাব দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ওই দু'রকম নোটের ৯৭ শতাংশই ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিল। পুরোটাই পড়ত, কিন্তু আকস্মিক ভাবে জমা নেওয়া বন্ধ করে সরকার নিজের মুখ রক্ষার চেষ্টা করেছিল। কোনও কালো টাকা যদি উদ্ধার না হয়ে থাকে, জাল নোটের সমস্যা যদি না মিটে থাকে তা হলে এই অকালমৃত্যুগুলি তো ঘটেছিল অকারণে। আর তার দায় তো পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের। এই দায় সরকার এড়াতে পারে?

নোট-বাতিলের আর একটি কারণ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এর ফলে নগদের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। দেশের বাজারে নগদের লেনদেন ও চাহিদাও কমবে। তথ্য বলছে, পরের বছরগুলিতে নগদ লেনদেন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, আদতে সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রায় সমস্ত নগদ লেনদেনকে নজরদারির আওতায় আনা এবং সেই সঙ্গে শাসকদল ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে মেরে দেওয়ার ফলে রুগ্ন হয়ে পড়া ব্যাঙ্কগুলিতে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো। তার জন্যই কালো টাকার বিরুদ্ধে জেহাদকে ছল হিসাবে নিতে হয়েছে। সুপরিকল্পিত ভাবেই এমন একটা প্রচার তোলা হয়েছিল যেটাতে মানুষ ভেসে যাবে। বাস্তবে বাজারে নোটের জোগান কমাতে হলে যেভাবেই হোক প্রচলিত নোট তুলে নিতে হবে। এটা করতে গিয়ে যদি ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের বলা হয়, টাকা দেওয়া সম্ভব নয় কারণ টাকা আসছে না, তা হলে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। তাই, এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি গড়ে দেওয়া দরকার। তা করতে কালো টাকা ও তার কারবারিদের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণা এবং তাদের দেশপ্রেমকে হাতিয়ার করেছিল মোদি সরকার।

মানুষ জানতেও পারল না যে, পুরোটাই আগাগোড়া ছিল একটা পরিকল্পিত ধাপ্পা। এই নোট বাতিলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জমা ক্ষোভ চাপা দিতে ২০১৭-র উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে একটা চমক দেওয়া। এছাড়া নোট বাতিলের বিশেষ গোপন লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল লেনদেন বাড়ানো। কারণ, এতে সরকারের এবং পুঁজিপতিদের অনেক সুবিধা। তার মধ্যে অন্যতম হল, যন্ত্রনির্ভরতা বাড়িয়ে বহু কর্মী তারা ছাঁটাই করতে পারবে, সরকারি স্থায়ী পদ বিলোপ করতে পারবে। জনগণের এতে কী সুবিধা? কেউ কেউ মনে করছেন, ভালোই তো, লম্বা লাইনে না দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি দিতে পারছি, এমনকি একটা সিঙাড়া খেয়েও অনলাইন পেমেন্ট করতে পারছি। কিন্তু তারা সমস্যার মূল ধরতে পারেননি। ডিজিটাল লেনদেনের নামে আদতে সরকার সকলের উপর নিখুঁত নজরদারি বহাল করতে চাইছে। এটা পুঁজিপতি শ্রেণির বিশেষ চাহিদা। আবার সরকারি কর্তৃপক্ষও চাইলে যে কোনও ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে পারে। জানতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত তথ্যও। ফলে গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ফলে যে সাইবার প্রতারণাও বাড়ছে তা আজ অজানা তথ্য নয়।

সাধারণ মানুষ কি ব্যাঙ্কে টাকা রেখে চোরের হাত থেকে বাঁচতে পারছেন? সরকার সে ব্যাপারে কি উদ্যোগী? আদৌ নয়। ডিজিটাল লেনদেনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষই। বছর পাঁচেক আগে ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল ইনফর্মেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোটেকশন সেন্টারের তথ্য বলছে, ২০১১ থেকে ২০১৬-র মধ্যে ইন্টারনেটে আর্থিক হ্যাকিংয়ের সংখ্যা ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যে হ্যাকিংয়ের ঘটনার মধ্যে ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই নিশানায় ছিল স্মার্টফোন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ভারতে ১১৫৯২টি হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটেছে, যা ২০০৫ সালের তুলনায় ২৬ গুণ বেশি। এখন তার মাত্রা আরও তীব্র। তা হলে, কী দাঁড়াচ্ছে? কালো টাকা বা জাল নোট ইত্যাদি কোনও ব্যাপারে সরকারের কোনও উদ্বেগ নেই। এসবই লোক ঠকানোর বাহানা। আদতে সে চায় মালিক শ্রেণির চাহিদা মিটিয়ে চলতে। সরকারের সমস্ত কার্যকলাপ তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ। দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করে নির্মাণের কাজ শেষ করা এবং পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামোযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালুর দাবিতে

২৯ মে মহিষাদলে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ মিছিল

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলা অফিসের প্রবীণ কর্মী কমরেড গোপাল চিত্রকর নিউমোনিয়া এবং কিডনিজনিত রোগে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৩১ মে বহরমপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর শোনামাত্র জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু নেতা-কর্মী জেলা অফিসে পৌঁছান।

'৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে স্কুলছাত্র কমরেড চিত্রকর বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দরিদ্র শোলা-শিল্পী পরিবারে স্বদেশি আন্দোলনের পরিবেশ ছিল। ষাটের দশকের শুরুতে আত্মীয়তার সূত্রে আগরপাড়া গেলে আগরপাড়া জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক তথা এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড সনৎ দত্তের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই তিনি দলের শিক্ষার সংস্পর্শে আসেন।

১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড মাধব রায়চৌধুরীর সাথে বয়সে তরুণ কমরেড গোপাল চিত্রকরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দলের কর্মী হিসাবে তিনি কাজ শুরু করেন। জঙ্গিপুর শহরে এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিংহের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই তিনি জেলা অফিসে যাতায়াত শুরু করেন এবং 'ঝড়' সাপ্তাহিক-এর কর্মী হয়ে প্রচারকার্যের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

এক সময় দলের কাজের পাশাপাশি অভাবী সংসারের প্রয়োজন মেটাতে কমরেড গোপাল চিত্রকর খবরের কাগজ হকারির কাজ করতেন।

নব্বই দশকের শুরুতে কমরেড চিত্রকর ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি গরিব শিশুদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন এবং আশপাশের গরিব আদিবাসী পাড়ার খেটে-খাওয়া মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অফিসে আসা কর্মী, সমর্থক, দরদিদের তিনি প্রিয়জন ছিলেন। সাধারণ মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারতেন তিনি। প্রথাগত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ না পেলেও তাঁর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। কমরেড চিত্রকর ছিলেন উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একজন মানুষ। সন্তানতুল্য কমরেডদের নেতৃত্বেও তিনি আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারতেন।

অসংখ্য নেতা-কর্মী-সমর্থক চোখের জলে প্রয়াত কমরেড গোপাল চিত্রকরকে বিদায় জানান। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য জেলা নেতা কমরেড কুণাল বিশ্বাস সহ জেলা নেতৃবৃন্দ, জেলা অফিস, বিভিন্ন গণফ্রন্ট ও ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

কমরেড গোপাল চিত্রকর লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

পিএফ-এ সুদ কমানো শ্রমজীবী জনগণের উপর তীব্র আঘাত

কেন্দ্রীয় সরকার এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ কমিয়ে মাত্র ৮.১ শতাংশ করেছে। যা বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৪ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, এইভাবে সুদ কমানোর ফলে ইতিমধ্যেই চরম আর্থিক দুর্দশার শিকার কোটি কোটি প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাহক সহ সব স্তরের শ্রমজীবী মানুষের উপর এ এক মারাত্মক আঘাত।

তিনি বলেন, ইপিএফ-এর অছি পরষিদে এআইইউটিইউসি সহ ট্রেড ইউনিয়নগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেও কেন্দ্রীয় সরকার একতরফা ভাবে সুদ কমানোর সিদ্ধান্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিল। চরম শ্রমিক বিরোধী এবং পুঁজিপতি তোষণকারী উদারীকরণ এবং ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কের সুদ বাড়িয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক পিএফ-এর সুদ বাড়িয়ে কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার বদলে ঠিক বিপরীত কাজটি করল। এছাড়া হাজার হাজার পিএফ গ্রাহকের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির ন্যায্য দাবিতেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করছে না।

পিএফ অছি পরিষদে এআইইউটিইউসি বারবার দাবি জানিয়েছে নামমাত্র ন্যূনতম পেনশন নয়, উপযুক্ত হারে তা বাড়াতে হবে। অথচ এই বিষয়টির ফয়সালা না করে সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত অবিলম্বে ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির দাবি জানান। পিএফ সদস্য সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের কাছে এআইইউটিইউসি আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী এই জঘন্য সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

টিএমসিপি হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি

মেখলিগঞ্জ কলেজে ২৮ মে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবিতে দেওয়াল লিখতে গেলে এআইডিএসও কর্মীদের মারধর করে টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা। সুনির্দিষ্ট নাম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এর পরেও কলেজের ছাত্র নারায়ণ চন্দ্র বর্মন, দয়াল বর্মন, হরেন বর্মন কলেজে গেলে টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা তাদের উপর আবার ব্যাপক হামলা চালায় এবং অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। গুরুতর আহত হরেন বর্মনকে মেখলিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এই দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৩১ মে কোচবিহার এসপি অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও।

সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আসিফ আলম বলেন, অবিলম্বে ছাত্রকর্মীদের উপর আক্রমণকারী টিএমসিপি দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, কলেজ ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং কলেজে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু পঠন-পাঠন চালু করতে হবে। এ দিন এসপি অফিসে ঢোকার মুহূর্তে পুলিশ বাধা দিলে সেখানে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ চলে। পরে এসপি ডেপুটেশন নিতে বাধ্য হন। ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে ১ জুন জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি পেশ

মুর্শিদাবাদের পাঁচটি পৌরসভার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা ৩ জুন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তরে

বিক্ষোভ দেখান ও স্মারকলিপি দেন। পশ্চিমবঙ্গের ১২৬টি পৌরসভা ও নিগমে কর্মরত প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার পৌর স্বাস্থ্যকর্মী গত দু' বছর করোনা অতিমারিতে করোনা যোদ্ধা হিসেবে কাজ করায় মুখ্যমন্ত্রী মাসিক এক হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা ঘোষণা করলেও গত এক বছর জেলার কোনও পৌর স্বাস্থ্যকর্মী এই ভাতা পাননি।

কাজ ভিত্তিক ইনসেনটিভ নিয়মিত নয়, কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদার দাবি সহ বকেয়া ভাতা ও ইনসেনটিভ মেটানোর দাবিতে ইউনিয়নের ডাকে শতাধিক পৌর স্বাস্থ্যকর্মী মিছিল করে স্মারকলিপি দেন। ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডুর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে দেখা করলে তিনি বকেয়া ভাতা মেটানোর আশ্বাস দেন এবং কিছু ভাতা তৎক্ষণাৎ আদায় হয়। আন্দোলনের এই আংশিক সাফল্যে কর্মীদের মধ্যে ইউনিয়নের প্রতি আস্থা বাড়ে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আন্দোলনে

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির নিজস্ব ভবন তৈরি করে উপযুক্ত পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ সংযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা, স্থায়ীকরণের নিশ্চয়তা প্রদান, নিয়মিত মাসিক বিল পেমেন্ট, রেশন রেট ও জ্বালানি রেট বৃদ্ধি, হলুদ ও লবণ সরবরাহ, কেন্দ্র চলাকালীন নিরাপত্তা প্রদান, সরকারি ছুটি বৃদ্ধি, কর্মরত অবস্থায় কর্মী সহায়িকা মারা গেলে ঘোষিত তিন লক্ষ টাকা ভাতা উত্তরাধিকারীদের প্রদান, দপ্তরের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক কর্মীকে অ্যান্ড্রয়েড সেট ও সিম রিচার্জের ব্যবস্থা, নিউ পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপ স্থগিত করা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি দাবিতে ৩ জুন ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সুসজ্জিত মিছিল বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের নানা রাস্তা পরিক্রমা করে।

রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ডিপিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত, সাবিত্রী মাহাতো, আরিফা বেগম।

এআইইউটিইউসি মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সামসুল আলম। ডিপিও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করে কিছু দাবি দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেন।

বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকদের কনভেনশন

বেসরকারি স্কুলের ব্যবসায়িক মনোভাব ও দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও রেগুলেটরি বোর্ড গঠনের, সিপিসিআর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন

গঠন এবং প্রতিটি স্কুলে অভিভাবক ফোরামের মান্যতার দাবিতে ২৯ মে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে 'ইউনাইটেড গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন'-এর আহ্বানে অভিভাবক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলার প্রায় পঞ্চাশটি স্কুলের দুই শতাধিক অভিভাবক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র গুপ্ত এবং মীরাতুন নাহার, সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। শিক্ষাবিদ পবিত্র গুপ্ত বলেন, মেরুদণ্ড সম্পন্ন নীতিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অভিভাবকদের সক্রিয় হতে হবে। শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার বলেন, দেশের শিক্ষা ও তার অঙ্গনকে রক্ষার জন্য অভিভাবকদের এগিয়ে আসা দরকার। দেরিতে হলেও অভিভাবকদের এই সংগঠন আজ আশা জাগাচ্ছে। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষা ব্যবসার পণ্য নয়, অধিকার। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলোর প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন।

প্রতি বছর নানা অজুহাতে লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, চলছে বই-খাতা নিয়ে ব্যবসা। গত ৮ বছরে বেসরকারি স্কুলগুলিতে পড়ানোর খরচ বেড়েছে প্রায় ২০০ শতাংশ, যা মানুষের আয় বৃদ্ধির থেকে অনেক বেশি। অথচ রাজ্য সরকার নীরব দর্শক। ভারতের বহু রাজ্যে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি স্কুল নিয়ন্ত্রণের কোনও আইন নেই। নেই কোনও রেগুলেটরি বডি। শিক্ষাস্বার্থে নয় দফা দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় কনভেনশনে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com